যুগ-বাণী

[যুগ-দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগাচার্য বিবেকানন্দের অমৃত বাণী]

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সংকলিত

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
কাটোয়া

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

সন ১৩৫৮ এবং ১৩৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে কাটোয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছিলাম। তখন স্থানীয় ভক্তগণের অনুরোধে এই পুস্তিকা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নবযুগ প্রবর্তক উপদেশাবলী এক এক শত সংগৃহীত। কাটোয়া মহকুমার জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুর-স্বামিজীর যুগবাণী প্রচারই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। পুস্তিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ প্রদত্ত। সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় অনাবশ্যক বোধে উপদেশাবলীর মধ্যে বিষয়-বিভাগ করা হয় নাই। ভূমিকাস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত হইয়াছে। ভূমিকা পাঠান্তে উপদেশ পঠন সমীচীন। এই পুস্তিকা পড়িয়া বৃহত্তর জীবনী এবং সমস্ত উপদেশ জানিতে আগ্রহ জন্মিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। দাঁইহাট-পাইকপাড়ার ধনী-ভক্ত শ্রীহৃষিকেশ মিত্র এই পুস্তিকা প্রকাশের সমুদয় ব্যয় বহন করিয়াছেন। বেলুড় হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার বি-এ, বি-টি ইহার একটি প্রুফ সযত্নে দেখিয়া দিয়াছেন। এইজন্য ইঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কাটোয়া মহকুমার প্রতিগৃহে এই পুস্তিকা

প্রচারিত ও পঠিত হউক—ইহাই আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। ইহার লভ্যাংশ কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-পূজায় ব্যয়িত হইবে। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় শেষে বলি, ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। অলমিতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম **স্বামী জগদীশ্বরানন্দ**

ফাল্গুন-পূর্ণিমা, ১৩৫৯

বরদা, মেদিনীপুর।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

মাত্র তিন চার মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। ইহা হইতে বোঝা যায়, এই পুস্তিকা কিরূপে সমাদৃত হইয়াছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-ধারা উক্ত অঞ্চলে কিরূপে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এই সংস্করণে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয় নাই। প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণ সমাদর পাইলেই পুনরায় ধন্য হইব। ইতি—

জন্মাষ্টমী, ভাদ্র, ১৩৬০ **স্বামী জগদীশ্বরানন্দ**

বেলুড়, হাওড়া।

যুগ-দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ
ও
যুগাচার্য বিবেকানন্দ

এক

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বর্তমান যুগ-দেবতা। তৎশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান যুগাচার্য। এই যুগ্ম পুরুষ সম্বন্ধে দুইটি নাটক সম্প্রতি কলিকাতায় ও সহরতলাতে অভিনীত হইয়াছে। এই মহাপুরুষ-যুগলের জীবনী ও বাণী বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি বহু দেশী ও বিদেশী ভাষায় লিখিত এবং প্রকাশিত। তাঁহাদের নামে ভারতে, সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, মালয়ে, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, মরিশাসে, ও আমেরিকায় অসংখ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত। তাঁহাদের ভাবধারা ধর্ম-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। আধুনিক যুগকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ বলা যাইতে পারে। সেইজন্য তাঁহাদের উপদেশ বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। গদাধরের সন্ন্যাস-গুরু তোতাপুরী কর্তৃক 'রামকৃষ্ণ' নাম প্রদত্ত। গদাধর ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন (১৮৩৬ খ্রীঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী) বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে হুগলী জেলার অন্তর্গত কামার-পুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শততম জন্ম-বার্ষিকী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সারা দুনিয়াতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার জন্মস্থানে প্রস্তরময় স্মৃতি-মন্দির নির্মিত ও তন্মধ্যে তাঁহার

মর্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মাতা ও পিতার নাম চন্দ্রমণি দেবী ও ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। ক্ষুদিরাম ধর্মপ্রাণ ও সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে যাইয়া তিনি স্বপ্ন দেখেন, ভগবান্ বিষ্ণুদেব তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। তৎকালে ভাগ্যবতী চন্দ্রমণিও অনেক অলৌকিক দর্শন লাভ করেন। বাল্যে গদাধর 'চাল-কলা বাঁধা' বিদ্যায় একেবারে মনোযোগী হন নাই। বাল্যকালেই তাঁহার বহু বার ভাব-সমাধি হয়। পিতৃবিয়োগের পর বালক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কলিকাতায় আসেন। রাণী রাসমণি কর্তৃক ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে মে) স্নানযাত্রার দিন গঙ্গাতীরবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বর গ্রামে কালীবাড়ী স্থাপিত হইলে তিনি অগ্রজ রামকুমারের সহিত তথায় পূজক নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৫৫ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে অবস্থান করেন। তখন তাঁহার জীবন-নদীতে ধর্ম-সাধনার যে পূত স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা ভারতেতিহাসে অভূতপূর্ব। কালীপূজা করিতে করিতে তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেন। পাষাণ প্রতিমার পরিবর্তে চিন্ময়ী মূর্তি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, প্রতিমা জীবন্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিমার নাকের কাছে তুলা ধরিয়া দেখিলেন, দেবীর নিঃশ্বাস পড়িতেছে! নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া তিনি দেখিতেন, সত্য সত্যই মা কালী তাহা গ্রহণ করিতেছেন! তিনি দেখিতেন, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নার আলোকে মা কালী মন্দির-শিখরে উঠিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেছেন! কিন্তু জড় বস্তুবৎ তাঁহার চিন্ময়ী মূর্তির কোন ছায়া নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর সহিত কথা

বলিতেন, সর্বদা ভাবের ঘোরে থাকিতেন, ভাব-জগৎ তাঁহার নিকট বাস্তব প্রতীত হইল।

কালীদর্শন লাভের পর তিনি একটির পর একটি তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হইলেন। তৎকালে প্রচলিত চৌষট্টিখানি তন্ত্রের সকল প্রধান সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিলেন। তদন্তে বৈষ্ণব এবং বেদান্ত সাধনায়ও তিনি উত্তীর্ণ হন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নির্দেশে বহুবিধ তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সাধনায় তিনি সংসিদ্ধ হন। কোন সাধনায় সিদ্ধ হইতে তিনি তিন দিনের বেশী সময় নেন নাই। বৈদান্তিক তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক তিন দিন তিনি নিৰ্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন। চল্লিশ বৎসর কঠোর তপস্যার ফলে গুরু যে সমাধি লাভ করেন, তাহাতে শিষ্য তিন দিনেই আরূঢ় হইলেন! কি অদ্ভুত একাগ্রতা! নির্বিকল্প সমাধি লাভের পর তিনি পঞ্চম বর্ষ বয়স্কা বালিকা সারদামণির সহিত বিবাহিত হন। সারদার বয়স যখন বিশ বৎসর, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ জীবন্ত জগদম্বা জ্ঞানে পূজা করেন। এই অপূর্ব ঘটনা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রিতে ঘটিয়াছিল। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ খ্রীষ্টান ও ইসলাম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। সর্বধর্ম সাধন করিয়া তিনি জানিলেন, যত মত তত পথ। পার্থসারথীর পাঞ্চজন্যে যে সমন্বয়-সংগীত নিনাদিত হইয়াছিল, তাহাই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-বীণায় উদাত্ত সুরে ঝংকৃত হইল। ঋগ্বেদের সার বাণী 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'—সদ্বস্তু ব্রহ্ম অদ্বৈত, বিপ্রগণ তাঁহাকে বহু ভাবে বর্ণনা করেন। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ-মূর্তি, মূর্তগীতা।

জার্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলার প্রথমে ইংরাজিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী ইংলণ্ড হইতে প্রকাশ করিলেন। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ ফরাসী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের যে জীবনী লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন, "ত্রিশ কোটী হিন্দুর ত্রিশ শতকের সাধনায় সঞ্চিত আধ্যাত্মিকতা জমাট বাঁধিয়া শ্রীরামকৃষ্ণে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।" ফরাসী মনীষীর উক্তি অতিশয় সারগর্ভ। মহাত্মা গান্ধী শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরাজি জীবনীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "রামকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী ধর্মসাধনার অপূর্ব ইতিহাস। তাঁহার জীবনালোকে মানুষ ধর্মবিশ্বাসী হইতে এবং ঈশ্বর দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহার জীবনী পাঠে এই ধারণাও বদ্ধমূল হয় যে, ঈশ্বরই জগতের পরম সত্য এবং ধর্মই জীবনের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন দেবত্বের জীবন্ত বিগ্রহ।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটি ক্ষুদ্র কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণকে এই ভাবে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছেন—

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা।
　　ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা॥
তোমার জীবনে অসীমের লীলা-পথে।
　　নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে॥
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি।
　　সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি॥

শ্রীরামকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট জীবনী লিখিয়াছেন তৎশিষ্য স্বামী সারদানন্দ। উক্ত পুস্তকের নাম 'রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'। উহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন

তৎশিষ্য শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত পাঁচ খণ্ড "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে।" পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীদিলীপ কুমার রায় তাঁহার কোন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "আমার যদি আজ ফাঁসীর হুকুম হয় এবং আমার শেষ ইচ্ছা জানাইতে বলে, আমি তখনই বলিব, 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঁচ খণ্ড চাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবাহিতা পত্নীর সহিত কোন দৈহিক সম্পর্ক রাখেন নাই। সারদাকে তিনি ধর্মজীবনের সঙ্গিনী করিয়া গার্হস্থ্যের আদর্শ দেখাইলেন। তৎশিষ্য দুর্গাচরণ নাগ শ্রীগুরুর পদানুগ হইয়া আদর্শ গৃহস্থ রহিলেন। ১৮৮০।৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নরেন্দ্র, রাখাল, যোগেন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, গিরীশ, রামচন্দ্র, তারক ঘোষাল, সুবোধ, হরিপ্রসন্ন, গঙ্গাধর, অঘোরমণি, গোলাপ সুন্দরী, গৌরীপুরী, যোগীন্দ্রমোহিনী, সারদাপ্রসন্ন, শরৎ, শশী, লাটু, হরি, কালী, পূর্ণচন্দ্র, দুর্গাচরণ, শ্রীম, বলরাম প্রভৃতি ভক্তগণ আসিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে তিনি গলরোগে আক্রান্ত হইয়া কাশীপুরে একটি বাগান-বাড়ীতে যাইয়া চিকিৎসার্থ অবস্থান করেন। তথায় তিনি নরেন্দ্র প্রমুখ ১১।১২ জন শিষ্যকে গেরুয়া কাপড় দেন। দেহরক্ষার কয়েক দিন পূর্বে তিনি প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং একাধারে রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" ঠাকুর রামকৃষ্ণ ১২৯৩ সালে ৩১শে শ্রাবণ (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট) রাত্রি ১টা ২ মিনিটের সময় কালী নাম উচ্চারণান্তে মহাসমাধিতে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নরদেহে ৫১ বৎসর পাঁচ মাস ২৫ দিন ছিলেন।

দুই

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্তই স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্ববিদিত হন। নরেন্দ্র কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় ষ্ট্রীটে তিন সংখ্যক গৃহে স্বীয় পিতৃভবনে ১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ (১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী) প্রাতঃকালে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি ছিলেন। তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী পুত্র-কামনায় কাশীধামস্থ বীরেশ্বর শিবের পূজা করিয়া নরেন্দ্রকে লাভ করেন। নরেন্দ্র পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ অদ্যাপি জীবিত এবং পিত্রালয়েই থাকেন। বালক নরেন্দ্রের অদ্ভুত মেধাশক্তি ছিল। একবার পড়িয়া বা শুনিয়া তিনি বিষয়টি মনে রাখিতে পারিতেন। বাল্য সঙ্গীদের লইয়া তিনি খেলাধূলা, পড়াশুনা ও গান-বাজনাদিতে মাতিয়া থাকিতেন। বাল্যে নিদ্রা যাইবার পূর্বে ভ্রূযুগলের মধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতেন। তখন ধ্যান করিবার সময় তিনি ভগবান বুদ্ধের দর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, অসীম সাহসী ও অত্যন্ত দুরন্ত বালক ছিলেন।

এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া যখন তিনি কলেজে এফ-এ পড়িতে-ছিলেন, তখন একদিন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হেষ্টি সাহেবের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতে পান। ধর্মানুরাগের আতিশয্যে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতিকে দর্শন করেন। কিন্তু কেহই তাঁহার ধর্ম-জিজ্ঞাসা চিরতরে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণেশ্বর

কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?" দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি। তোমাকে যেমন দেখছি, তার চেয়ে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবেই তাঁকে দেখেছি ও তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তোমাকে ঈশ্বর দেখাতে পারি।" এই বলিয়া যুগ-দেবতা নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া ঈশ্বর-দর্শন করাইলেন। ঠাকুরকে দেখিবার পর নরেন্দ্রের জীবনে বিপ্লব উপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে তিনি ধর্মসাধনায় নিমগ্ন এবং ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে কিছু কাল না দেখিলে অস্থির হইতেন। তিনি এই বালকের সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং বলিতেন, "নরেন্দ্র সপ্তর্ষি মণ্ডলের এক ঋষি এবং জগদ্ধিতায় অবতীর্ণ।" গুরু একদিন স্বীয় অধ্যাত্ম সম্পদ শিষ্যকে ধ্যানযোগে দান করিয়া নিঃস্ব হইলেন। কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে শিষ্য গুরু-কৃপায় নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। নরেন্দ্র সর্বদা সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতে ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু ঠাকুর বলিলেন, "তোকে মায়ের কাজ করতে হবে। সেইজন্য ত তুই এসেছিস্ আমার সঙ্গে।" শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পরে নরেন্দ্রাদি শিষ্যগণ বরাহনগরে মঠ স্থাপন ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বরাহনগর মঠ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আলমবাজারে উঠিয়া যায় এবং সেস্থান হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড়ে আসে। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর কয়েক বৎসর সমগ্র ভারত পর্যটন করেন এবং বর্তমান ভারতের

দুরবস্থা অবগত হন। দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমায় সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত কন্যাকুমারী মন্দিরে ধ্যানস্থ হইয়া তিনি ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইলেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানার্থ যাত্রা করিলেন। উল্লিখিত মহাসভায় তাঁহার বক্তৃতাবলী সর্বাপেক্ষা প্রেরণাপ্রদ হইল। সেই সভা সমাপ্ত হইলে তিনি মার্কিন যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় দেশসমূহে বেদান্ত প্রচার করিলেন। স্বামিজীর পাশ্চাত্য বিজয়ে স্বদেশে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও বিদেশে উহার ব্যাপক প্রচার হইল। ঋষি অরবিন্দ সত্যই বলেন, "স্বামিজীর পাশ্চাত্য বিজয়ের দ্বারা সূচিত হইল, ভারত শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য জাগে নাই ; ভারত জগজ্জয়ের জন্য জাগ্রত।" ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামিজী ভারতে ফিরিলেন এবং কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত সারা দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা দিলেন। ইহাতে ভারতব্যাপী অভূতপূর্ব ধর্মজাগরণ আসিল। তৎকর্তৃক ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইল। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ, অখণ্ডানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ ভারতের নানা স্থানে রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও সেবাধর্ম প্রচার করিলেন।

স্বামিজী রামকৃষ্ণ সংঘের আদর্শ রাখিলেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" অর্থাৎ আত্মমুক্তি এবং জগতের সেবাই সংঘের মুখ্য আদর্শ। ফরাসী মনীষী মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁ বলেন, "বিগত শতকে বর্তমান ভারতে যত সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম-

প্রচারক আবির্ভূত হইলেন, তন্মধ্যে বিবেকানন্দ ব্যতীত অন্য কেহ সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য মোহমুক্ত ছিলেন না।” পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় মোহিত হইয়া ভারত প্রাচীন আদর্শ বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিল। স্বামিজী কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, “ভারত যদি পাশ্চাত্য বা ইংলণ্ডের জাতীয় আদর্শ গ্রহণ করে, ইহা মৃত্যুর কবলে পড়িবে।” মূর্ত মহেশ্বরের বজ্রনাদে বর্তমান ভারতের মোহ-ভঙ্গ হইল। তাই স্বামিজী যুগাচার্য এবং তাঁহার উপদেশই যুগবাণী। স্বামিজী ঠাকুরের নিকট শিখিলেন—শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে। মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের আসল স্বরূপ বিকৃত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতোক্ত হিন্দুধর্মই প্রকৃত বৈদিক ধর্ম। স্বামিজী হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ যুগোপযোগী করিয়া সুব্যক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরে বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কেহই বেদ-বাণী সম্যক্ প্রচার করিতে পারেন নাই। স্বামিজীর বাণীই বেদ-বাণী, ভারত-বাণী। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, “যদি ভারতকে জানিতে চাও, বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পড়।” মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে আসিয়া বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দিরের তলায় দাঁড়াইয়া সমবেত জনসভায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি সেবাদর্শ স্বামিজীর বাণীতেই পাইয়াছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বামিজী-প্রচারিত যুগাদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ইংরাজ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা স্বামিজীর স্মৃতি-কথায় লিখিয়াছেন, “স্বামিজী যে বাণী দিয়াছেন, তাহার বিশালতা ও গভীরতা অনুভবের সময় এখনো আসে নাই।” স্বামিজী জীবনের শেষ দিন বেলুড় মঠের

প্রাঙ্গণে একাকী পাইচারি করিতে করিতে স্বগতোক্তি করেন, "যদি আর একটি বিবেকানন্দ থাকিত সে বুঝিত, এই বিবেকানন্দ কি করিয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আরো অনেক বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটিবে।"

বিবেকানন্দের বজ্র-বাণী বাংলার আকাশে বাতাসে সুযোগ্য গ্রাহকের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্বামিজীর অনাহত আহ্বান কি বাঙ্গালী তরুণ-তরুণীরা শোনে নাই? বাংলার যুবক-যুবতীর উপর স্বামিজী যে গুরু দায়িত্ব দিয়াছেন তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। অর্ধ শতক পূর্বে তিনি যোগবলে বুঝিয়াছিলেন, ভারত অভাবনীয় উপায়ে স্বাধীন হইবে। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও পাশ্চাত্য মোহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। সাংস্কৃতিক জাগরণ ব্যতীত ভারত স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বর্তমান ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও রাষ্ট্রগঠন প্রাচীন আদর্শের অনুবর্তী হওয়া উচিত। আমাদের সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ধর্ম ও দর্শনাদি অতীতের আলোকে সংস্কৃত হওয়াই যুগ-প্রয়োজন। বংলা ও সংস্কৃত ভাষাদ্বয়ের সম্যক্ সমৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। শুধু বাংলার তরুণরা নহে, বাংলার তরুণীরাও এই যুগ-বাণী স্ব স্ব জীবনে রূপায়িত করুক। যদি আমরা তাহা করিতে পারি তাহা হইলে কবি অতুলপ্রসাদের ভাষায় "ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" স্বামিজী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ভারতাদর্শই বর্তমান সভ্য জগৎকে প্রভাবিত করিবে। যুগাচার্যের বাণী ক্রমশঃ সত্য

হইতেছে। স্বামিজী ১৩০৯ সালে ২০শে আষাঢ় (১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই) শুক্রবার রাত্রে বেলুড় মঠে স্বকক্ষে মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করেন। তিনি মানবদেহে মাত্র ৩৯ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন ছিলেন। তাঁহার স্থূলদেহ বেলুড় মঠে ভস্মীভূত এবং তদুপরি পরে স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

———

যুগবাণী

এক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ

১। ঈশ্বর সাকার বটে, আবার নিরাকারও বটে। তা ছাড়া তিনি যে আরও কত কি, তা কে জানে? ভক্তের জন্য তিনি সাকার, আর জ্ঞানীর পক্ষে তিনি নিরাকার।

২। সাকার ও নিরাকার ঈশ্বর কেমন জান? যেমন জল ও বরফ। জল জমেই বরফ হয়। বরফের ভিতরে ও বাহিরে জল। দেখ, জলের একটা বিশেষ আকার নাই; কিন্তু বরফের আকার আছে। ভক্তি-হিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরের জল জমে বরফের মত নানা আকার ধারণ করে।

৩। নিরাকার দুই রকম—পাকা ও কাঁচা। পাকা নিরাকার সব চেয়ে উঁচু ভাব। সাকার ধরে সেই নিরাকারে পৌঁছুতে হয়। কাঁচা নিরাকারে চোখ বুজলেই অন্ধকার।

৪। কালীরূপ, কি শ্যামরূপ দূরে বলে চৌদ্দ পোয়া শ্যামবর্ণ দেখায়। সূর্য দূরে বলে ছোট দেখায়। তার কাছে গেলে এত বড় দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না।

৫। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়, কাছে থেকে দেখলে কোন রঙ নাই। দীঘির জল দূর থেকে সবুজ, নীল, কাল দেখায়। কাছে গিয়ে তুলে দেখ, তার কোন রঙ্ নাই।

৬। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে ততই ধারণা হবে, তাঁর নাম-রূপ নাই। আবার তিনি পুরুষ প্রকৃতি দুই-ই। সকল দেবতা তাঁর এক একটি রূপ।

৭। তিনি বিভিন্ন অধিকারীর জন্য নানা ধর্ম, নানা মত করেছেন। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয় বলে তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন।

৮। যে সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সে তাঁর আসল স্বরূপ জানতে পারে। কালীঘরে ধ্যান করতে করতে দেখলুম, শ্যামা মা খান্‌কির বেশ ধরেছেন। তাই বলছি, সব মানতে হয়। কখন তিনি কিরূপে দেখা দেন, কে জানে ?

৯। সোনার আতা দেখলে যেমন আসল আতা মনে পড়ে, তেমনি মাটীর মা কালী দেখলে ভক্তের মনে আসল মা কালীর, মা আনন্দময়ীর স্বরূপ উদয় হয়।

১০। যেমন কারো ফটোগ্রাফ দেখলে তাকে মনে পড়ে তেমনি প্রতিমায় পূজা করতে করতে ঈশ্বরের সত্যরূপ উদ্দীপন হয়।

১১। সাকার মূর্তিকে কাঠ, মাটি, পাথর মনে করো না,

সচ্চিদানন্দ-ঘন বলে জ্ঞান করো। যেমন এই জল জমে বরফ হয়, সেই রকম মনে করবে। তাহলে আর কোন গোলযোগ থাকবে না।

১২। যদি মাটীর প্রতিমা পূজা করতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তাহলেও তাঁকেই যে ডাকা হচ্ছে তা তিনি জানেন।

১৩। নিরাকার ও সাকার দুই-ই সত্য। তোমার যেটিতে বিশ্বাস সেটি ধরে থাকবে।

১৪। তিনি সাকার, কি নিরাকার যদি ঠিক করতে না পারিস্ তো এই বলে প্রার্থনা করিস্, 'হে ভগবান্, তুমি সাকার কি নিরাকার আমি বুঝতে পারি না। তুমি যাহাই হও, আমায় কৃপা কর, দেখা দাও।'

১৫। ঈশ্বর নর দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। তিনি সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে; কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা মিটে না।

১৬। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না, একথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বলতে পারি?

১৭। তিনি নরলীলা করবার জন্য মানুষের ভিতর অবতীর্ণ হন; যেমন—রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব।

১৮। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে, গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম। তাহলেই হল। গঙ্গা স্পর্শ করতে হলে সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না।

১৯। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নররূপে দেখতে পারলে তবে ত ভক্তেরা ভালবাসতে পারবে। পূর্ণ ও অংশ—যেমন অগ্নি

ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। জ্ঞানী নিরাকার ঈশ্বর চিন্তা করে, অবতার মানে না।

২০। এক হাতে কর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

২১। সংসার কর্মভূমি। এখানে দুই দিনের জন্য কর্ম করতে আসা। যেমন—পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কলকাতায় কর্ম করতে আসে। কিছু কর্ম করা দরকার—সাধন।

২২। সংসার ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই ভাল। এই যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। শরীরের যখন যেটি দরকার হাতের কাছেই পাবে।

২৩। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়। জোর করে সংসার থেকে চলে আসা ভাল নয়। সংসারের মধ্যে বাস করে যে সাধন করতে পারে সে-ই ঠিক বীর সাধক।

২৪। সর্বদা ইন্দ্রিয়-সংযম ও ধর্মসাধন করতে করতে সাধক যখন নিজের মনকে সম্পূর্ণ বশে এনে শুদ্ধ করে, সেই মনই তখন তার গুরু হয়ে থাকে।

২৫। 'গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা না মিলে এক।' উপদেষ্টা অনেক পাওয়া যায়; কিন্তু উপদেশ অনুসারে কাজ করে এরূপ লোক অতি অল্প মেলে। 'নাক ভেরে কেটে তাক' —বোল মুখে বলা সহজ, কিন্তু হাতে বাজান কঠিন। সেই রকম ধর্মকথা বলা সোজা, কাজে করা কঠিন।*

---

* সন্ত তুলসীদাস তাই বলেন, "পর উপদেশ কুশল বহুতেরে যে আচরহি তে নর ঘনেরে।"

২৬। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। কুলোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য; কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা উচিত নয়। বাঘের ভিতর ঈশ্বর আছেন সত্য বটে; কিন্তু বাঘের সম্মুখে যাওয়া যায় না।

২৭। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক, জুগুপ্সা (গোপনেচ্ছা), অভিমান—এই সব পাশ। এগুলি ত্যাগ করতে হয়। এই সব গেলে তবে জীবের মুক্তি হয়।

২৮। ছেলেবেলায় যারা ঈশ্বরানুরাগী হয় ও সাধনভজন করে, তাদেরই ঈশ্বর লাভ হয়ে থাকে। কাঁচা মাটীতে গড়ন হয়, পোড়া মাটীতে আর গড়ন চলে না। টিয়া পাখীর গলায় কাঁটা উঠলে আর পড়ে না, ছোট বেলায় পড়ালে শীঘ্র পড়ে।

২৯। মানুষের মন যেন সরষের পুঁটলি। সরষের পুঁটলি একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান শক্ত হয়ে উঠে, তেমনি মানুষের মন একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে তখন গুটিয়ে আন কঠিন হয়ে পড়ে।

৩০। শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই আছে তাদের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা ঢোকা বড় কঠিন।

৩১। সহ্য গুণের চেয়ে আর গুণ নাই। যে সয় সেই রয়। যে না সয় সে নাশ হয়। এই জন্য তিনটে স—শ, ষ, স।

৩২। মানুষের সঙ্গে থাক্‌তে গেলেই দুষ্ট লোকের কাছ থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য ক্রোধের আকার দেখান দরকার। কিন্তু যে অনিষ্ট করে তার অনিষ্ট করা ভাল নয়। দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে হয়। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নেই।

৩৩। ভগবান্ মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দন।

৩৪। শোর গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে সে লোক ধন্য। আর হবিষ্য অন্ন খেয়েও যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে, তাহলে সে ধিক্।

৩৫। সংসারে বাপ-মা পরম গুরু। তাঁরা যত দিন বেঁচে থাকেন, যথাশক্তি তাঁদের সেবা করতে হয়। আর তাঁরা মরে গেলে যথাসাধ্য তাঁদের শ্রাদ্ধ করতে হয়।

৩৬। এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ ধারণ করে যে সচ্চিদানন্দকে লাভ করতে না পারে, তার জন্মধারণ করাই বৃথা।*

৩৭। যার ঈশ্বরে মন আছে সেই ত মানুষ। মানুষ, আর মানহুঁস। যার হুঁস আছে সে নিশ্চিত জানে—ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। সে-ই মানহুঁস। আর যারা কামিনী-কাঞ্চনরূপ বিষয় নিয়ে মত্ত, তারা সব সাধারণ মানুষ।

৩৮। ভগবান্ দুই কথায় হাসেন। যখন ডাক্তার এসে বলে, 'ভয় কি? আমি রোগীকে ভাল করবো' তখন তিনি এই বলে হাসেন, 'আমি মারছি, আর এ কিনা বলে, আমি বাঁচাব।' আর যখন ভায়ে ভায়ে দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, তখন এই মনে করে হাসেন—আমার জগৎব্রহ্মাণ্ড; কিন্তু ওরা বলে, এদিক্‌টা আমার আর, ওদিক্‌টা তোমার।

---

* কঠ উপনিষদে আছে, "ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যম্ অস্তি নোচেৎ ইহাবেদীঃ মহতী বিনষ্টিঃ।" অর্থাৎ ইহ জীবনে যদি তাঁকে জানা যায় তাহা হলে জীবন সার্থক; নচেৎ মহতী বিনষ্টি হয়।

৩৯। জীবে দয়া—জীবে দয়া? তুই জীবকে দয়া করবার কে? জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা কর।

৪০। সাধু সন্ন্যাসী গৃহস্থের বাড়ী থেকে অভুক্ত ফিরে গেলে গৃহস্থের বড় অকল্যাণ হয়। সাধুদিগকে শুদ্ধ দ্রব্য দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিষ সাধুকে দিতে নাই।

৪১। সাধুর নিকট, দেবতার নিকট, শুধু হাতে যেতে নাই। কিছু না হলে একটা হরিতকীও হাতে করে যেতে হয়। *

৪২। সাধু-সন্ন্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। সকাল বেলা উঠে অন্য মুখ না দেখে সাধু-সন্ন্যাসীর মুখ দেখে উঠা ভাল।

৪৩। 'মাগ্‌নেসে ছোটা হো যাতা হ্যায়।' স্বয়ং ভগবান্ যখন ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকেও বামনরূপ ধরতে হয়েছিল। তাই অপরের কাছে কোন বিষয় চাইতে গেলে ছোট হতে হয়।

৪৪। মানীকে মান না দিলে ভগবান্ রুষ্ট হন। তাঁর শক্তিতেই ত তাঁরা বড় হয়েছেন। তিনিই ত তাঁদিগকে বড় করেছেন। তাঁদিগকে অবজ্ঞা করলে তাঁকে অবজ্ঞা করা হয়। †

৪৫। যখন একলা থাকবে তখন ভক্তিশাস্ত্র পড়বে—শ্রীমদ-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—এই সব পড়বে।

৪৬। যে সর্বদা পাপ পাপ করে, সে পাপী হয়ে যায়। বাইবেলে মানুষকে পাপী বলেছে। তা ঠিক নয়।

* শাস্ত্রও বলেন, 'রিক্তহস্তং ন পশ্যেৎ তু রাজানং ভিষজং গুরুং।'

† গীতাতে (১০।৪১) আছে, "যাহা যাহা বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত), শ্রীমৎ (শ্রীমান্) বা উর্জিত (উৎসাহশালী) তাহা তাহাই ভাগবত শক্তির অংশ-সম্ভূত।

৪৭। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। আত্মহত্যা করলে ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হবে ; আর এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

৪৮। প্রতিমায় দেবতার আবির্ভাব হতে গেলে তিনটি জিনিষের দরকার। প্রথম—পূজারীর ভক্তি, দ্বিতীয়—প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয়—গৃহস্বামীর ভক্তি।

৪৯। দিনের বেলা বারুদ-ঠাসা করে খেতে হয়। আর রাতে পেটের এক কোণ খালি রেখে খেতে হয়।

৫০। একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয়; আর ঈশ্বরে ভক্তি হয়। একাদশীতে খই-দুধ খাবে।

৫১। এই ভাবে রোজ প্রার্থনা করবে, "মা, আমি তোমার শরণাগত। তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ নিলাম। অষ্ট সিদ্ধি চাই না, লোকমান্য চাই না, দেহ-সুখ চাই না, মা। কেবল এই কোরো, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি হয় ; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। তোমার মায়াময় সংসারের কামিনী-কাঞ্চনের উপর যেন আমার ভালবাসা না হয়। মা, তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন। কৃপা করে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।"

৫২। গঙ্গাজল জলের মধ্যে নয়, শ্রীবৃন্দাবনের রজ ধুলোর মধ্যে নয়, জগন্নাথদেবের প্রসাদ অন্নের মধ্যে নয়। এই তিনটী ব্রহ্মের স্থূল রূপ।

৫৩। ছ্যাখ, তিন জন রাত জাগে—যোগী, রোগী ও ভোগী।

৫৪। 'মুখ হল্‌সা, ভেৎর-বুঁদে, কাণতুলসে, দীঘল ঘোমটা নারী ; আর পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল বড় মন্দকারী।'

৫৫। যত মত, তত পথ। যেমন—এই কালীবাড়ীতে আসতে হলে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে। সেই রকম ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম মত দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের ঈশ্বর লাভ হয়ে থাকে।

৫৬। তিনি অনন্ত, তাঁকে পাবার পথও অনন্ত। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। ছাদে উঠতে হলে পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, মই, দড়ি, আবার আছোলা বাঁশ ইত্যাদি যে কোন উপায়ে যেমন উঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি পথ।

৫৭। এটা বলা ভাল নয়—আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ধর্ম ভুল। আমরা যা বুঝেছি তাই ঠিক, আর যে যা বলছে সব ভুল—এরূপ ভাবা অন্যায়।

৫৮। আমরা নিরাকার বলছি, অতএব তিনি নিরাকার। আমরা সাকার বলছি, অতএব তিনি সাকার। এই সব বুদ্ধির নাম 'মতুয়ার বুদ্ধি'। মানুষ কি তাঁর ইতি করতে পারে ?

৫৯। তাঁকে আগে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে বক্তৃতা, লেক্‌চার ইচ্ছা হয় ত কোরো। শুধু ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বললে কি হবে—যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে ?

৬০। অনেকে মনে করে, বই না পড়লে জ্ঞান হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা

ভাল। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পার্‌বে, কিন্তু তাঁকে পাবে না।

৬১। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই গুরুমুখে. সাধুমুখে শাস্ত্র-মর্ম শুনে নিতে হয়। সব সন্ধান জেনে তারপর ডুব দাও।

৬২। গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি, গাঁট। বিবেক-বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়লে গ্রন্থ পাঠে দাম্ভিকতা, অহঙ্কার বেড়ে যায় মাত্র।

৬৩। ঘি কাঁচা থাকলেই কল্‌কল্‌ করে। বই পড়ে কতকগুলো কথা বলতে পারলে কি হবে? একবার তাঁর আনন্দ পেলে বিচার-বুদ্ধি পালিয়ে যায়।

৬৪। পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে; কিন্তু পাঁজি নিঙ্‌ড়ালে এক ফোঁটাও জল বেরোয় না। তেমনি পুঁথিতে অনেক ধর্মকথা লেখা আছে। শুধু পড়লে হয় না, সাধন চাই।

৬৫। বড় বড় বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে আসে, তখন কত লোক তার উপরে চড়ে চলে যায়। তাতে সে ডোবে না। তেমনি যখন অবতারাদি আসেন, কত শত লোক তখন তাঁকে আশ্রয় করে তরে যায়।

৬৬। লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে. দূরে আলো পড়ে। সেই রকম সাধু-মহাপুরুষদের নিকটের লোকেরা তাঁদের বুঝতে পারে না, দূরের লোকেরা তাঁদের ভাবে মুগ্ধ হয়।

৬৭। অবতার, সিদ্ধ পুরুষ ও জীবে শক্তি লইয়াই প্রভেদ। যদি বল—যার ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ, শোক এই সব জীবধর্ম অনেক আছে, তিনি অবতার কেমন কোরে হবেন? তার উত্তর, 'পঞ্চ

ভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' দেখ না, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণাবতার রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

৬৮। মনকে একাগ্র করার জন্য ধ্যান করবার আগে কিছুক্ষণ হাততালি দিয়ে হরিবোল, হরিবোল বলবে। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে গাছের সব পাখী উড়ে যায়। সেই রকম আগে হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে মনের কুচিন্তা, অস্থিরতা, বিষয়-বাসনা ইত্যাদি চলে যায়।

৬৯। ধ্যান করবে—মনে, বনে, কোণে। ঈশ্বর-চিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভাল। যত হয় গুপ্ত তত হয় পোক্ত।

৭০। নিক্তির এক দিকে ভার বেশী হলে উপরের কাঁটা ও নীচের কাঁটার মুখ এক হয় না। উপরের কাঁটা ঈশ্বর, নীচের কাঁটা মানুষের মন। এই দুই কাঁটা এক হবার নামই যোগ। মানুষের মন চার দিকে নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে; তা থেকে কুড়িয়ে এনে পরমাত্মাতে মন স্থির করার নাম যোগ। ক্ষণ কাল তাঁর সঙ্গে যোগ হলেই মুক্তি। ঠিক দুপুরে ঘড়ির দুটো কাঁটা যেমন এক হয়ে যায়, ঠিক যোগ হলে সেরূপ হয়; জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হয়ে যায়. সমাধি হয়।

৭১। ভক্তদের গাঁজাখোরের মত স্বভাব। গাঁজাখোর যেমন আর একজন গাঁজাখোরকে পেলে খুব আনন্দিত হয়, সেই রকম এক ভক্ত আর এক ভক্তকে পেলে খুব খুসী হয়। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। ভক্তি হলে অস্পৃশ্য জাতি শুদ্ধ পবিত্র হয়।

৭২। ভক্ত যেমন ভগবান্ ছাড়া থাকতে পারে না, ভগবান্‌ও তেমন ভক্ত না হ'লে থাকতে পারেন না। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। ভাগবত, ভক্ত, ভগবান্ তিনে এক, একে তিন।

৭৩। শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক। শুদ্ধ জ্ঞান যেখানে, শুদ্ধা ভক্তিও সেখানে নিয়ে যায়। ঠিক্ ভক্তের কাছে হাজার বেদান্ত বিচার কর, আর জগৎ স্বপ্নবৎ বল; তার ভক্তি যাবার নয়।

৭৪। ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায়, এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। জগতের মাকে পেলে ভক্তিও পাবে, আবার জ্ঞানও পাবে।

৭৫। যার মন সর্বদা ঈশ্বরে আছে তাকেই ভক্ত বলে। ঠিক্ ভক্তের কোন ভয়-ভাবনা নাই। সে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

৭৬। ভক্তির 'আমি'-তে অহঙ্কার হয় না। এই 'আমি' আমির মধ্যে নয়। যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়, মিছরী মিষ্টির মধ্যে নয়।

৭৭। ভক্তি মেয়ে মানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান সাম্‌নের বাড়ী পর্যন্ত যায়। কলিযুগে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ পথ।

৭৮। কলিযুগের পক্ষে নারদীয়া ভক্তি। শাস্ত্রে যে সব কর্ম করতে বলেছে এখন তার সময় কই? কর্ম করতে যদি বল, তো ন্যাজা-মুড়া বাদ দিয়ে বলবে।

৭৯। মায়া কাকে বলে জান? বাপ মা ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র ভাগ্‌নে ভাইপো ভাই-ঝি—এই সব আত্মীয়দের প্রতি যে টান ও

প্রীতি সেটী মায়া। দয়া মানে—সর্বভূতে আমার হরি আছেন—এই জেনে সকলকে সমান প্রীতি।

৮০। জ্ঞানীর দেহ যেমন তেমনি থাকে। শুধু জ্ঞানাগ্নিতে তার কামাদি রিপু দগ্ধ হয়ে যায়। কালী-ঘরে বাজ পড়ার পর দেখা গেল, কপাটগুলির কিছু হয় নাই। শুধু ইস্ক্রুগুলির মাথা ভেঙ্গে গেছে। সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণই মাটীর ছাঁচের দরকার হয়। ঢালাই হয়ে গেলে মাটীর ছাঁচটা ফেলে দেওয়া যায়। ঈশ্বর দর্শন হলে শরীর ত্যাগ করা যায়। যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন না হয়, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে হয়। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে কুমার সেই গুলোকে ভেঙ্গে তাল পাকিয়ে আবার চাকে ফেলে, আবার নূতন হাঁড়ি তৈয়ার করে।

৮১। কাঁচা আমি ত্যাগ করতে হয়, পাকা আমিতে দোষ নাই। কাঁচা আমি, বজ্জাৎ আমি, সংসারীর আমি, অবিদ্যার আমি—যাতে বোধ হয় আমি কর্তা, আমি বিদ্বান্, আমি ধনবান্ এই সব। আর পাকা আমি, বালকের আমি, বিদ্যার আমি, ঈশ্বরের দাস আমি, ভক্তের আমি—যে আমি সমাধির পর লোকশিক্ষার জন্য, রসদানের জন্য কাহারো কাহারো থাকে। পাঁচ বছরের বালক কোন গুণের বশ নয়। তার জাত অভিমান নাই, শুচি অশুচি নাই, লোকলজ্জা নাই। বুড়োদের এই সব আছে। তাই বুড়োদের আমি কাঁচা আমি। পাকা আমি যেন নারিকেলের বালতোর দাগ, বা পোড়া দড়ি। বাল্‌তো খসে গেছে, এখন শুধু দাগ আছে। পোড়া দড়ির আকার মাত্র আছে, ফুঁ দিলেই উড়ে যায়।

৮২। বেদান্তের মতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ, একই পদার্থ। ব্রহ্ম কখনো পুরুষ ভাবে, কখনো বা প্রকৃতি ভাবে থাকেন—যেমন সাপ কখনো চলছে, কখনো বা স্থির আছে। যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম। আর যখন তিনি তিন গুণের অতীত, তখন তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। সাংখ্য দর্শনের মতে পুরুষ অকর্তা, প্রকৃতিই সকল কাজ করেন। প্রকৃতির এই সকল কাজ পুরুষ সাক্ষীস্বরূপ হয়ে দেখেন। প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে কোনও কাজ করতে পারেন না।

৮৩। সংসার-অরণ্যে সত্ত্ব রজ তমঃ তিন গুণ ডাকাতের মত জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। ব্রহ্মজ্ঞান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।

৮৪। তিন রকমের আনন্দ আছে—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ।

৮৫। এই দেহ-মন্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, অন্তরে সর্বদা জ্ঞান-দীপ জ্বেলে রাখতে হয়। অজ্ঞানী লোক যেন মাটীর ঘরে বাস করে, ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটা দেখতে পায়। আর জ্ঞানী ব্যক্তি সার্শীর ঘরে বাস করে, ঘরের ভিতরেও দেখতে পায়, আবার ঘরের বাহিরের জিনিষও দেখতে পায়।

৮৬। গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল—এসব যেন ভিন্ন ভিন্ন রকমের বালিশের খোল। সব রকম খোলের ভিতর যেমন একই জিনিষ তুলো ভরা থাকে, মানুষ গরু ঘাস জল পাহাড় পর্বত প্রভৃতি সব খোলগুলোর ভেতরেও সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন। ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত।

৮৭। জ্ঞানীর চারটি অবস্থা—বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ ও পিশাচবৎ।

৮৮। অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নাই। জ্ঞান অজ্ঞানের পার হলে তাঁকে জানতে পারা যায়।

৮৯। অমৃত সাগরে যাবার অনন্ত পথ। তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হলেই ঈশ্বরকে পাবে।

৯০। ঈশ্বরই কর্তা, আর সব অকর্তা—এর নাম জ্ঞান। ঈশ্বরই সৎ, আর সব অসৎ—এইটি জানার নামই জ্ঞান। আমি অকর্তা, তাঁর হাতের যন্ত্র। জীবে 'আমি কর্তা' এই অভিমান অজ্ঞান থেকে হয়।

৯১। পাপ. আর পারা কেউ হজম করতে পারে না। যদি কেউ লুকিয়ে পারা খায়, তাহলে কোন দিন না কোন দিন তার গায়ে পারা ফুটে বেরুবে। ঈশ্বরের নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। কর্মফল কেউ এড়াতে পারে না।

৯২। হাওয়া পাবার জন্যই পাখার দরকার। যদি হাওয়া আপনি আসে তাহলে আর পাখার আবশ্যক হয় না। যদি তাঁর উপর ভালবাসা এসে পড়ে, তাহলে পূজা হোম যোগ জপ এসব কর্মের আর কোন দরকার হয় না।

৯৩। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে আসবে। এমন কি, তাঁর নাম গুণগান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঙ্কারে লয় হয় এবং ওঙ্কার সমাধিতে লয় হয়। সমাধিতে ব্রহ্মদর্শন হয়।

৯৪। বড় লোকের বাড়ীর ঝি-চাকর কাজ করার সময় ভাবে মনিবের কাজ, নিজের কিছুই নয়। তেমনি সংসারে থেকে কাজ করবে ও ভাববে, সবই তাঁর কাজ।

৯৫। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে। তাদের সঞ্চয় করতে নাই। মৌমাছি কষ্ট করে মধু সঞ্চয় করলে আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে মধু নিয়ে যায়।

৯৬। গীতা পড়লে যা হয়, আর দশ বার গীতা শব্দ উচ্চারণ করলে তাই বুঝায়। যেমন গী-তা-গী-তাগী। তাগা কিনা— হে জীব, সর্ব ত্যাগ করে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় কর।

৯৭। সাঁকোর নীচে জল সহজে বেরিয়ে যায়, জমে না। তেমনি মুক্ত মানুষদের হাতে যে টাকা-পয়সা আসে তা থাকে না, অমনি খরচ হয়ে যায়। অর্থ যার দাস সে-ই মানুষ। আর যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়েও মানুষ নয়। তাদের ব্যবহার পশুর মত।

৯৮। বিচার করতে করতে মন স্থির হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে; একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই। সে বস্তুটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌। জ্ঞান-সূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পর, নির্বিকল্প সমাধির পর সেই অনন্ত বাক্যমনের অতীত অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে কত গভীর জল তার খবর দিবে কি? যেই নামা অমনি গলে যাওয়া।

৯৯। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে, আর কাঁদলে চিত্তশুদ্ধি

হয়। নির্মল জলেই সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রতিবিম্ব সূর্যই সগুণ ব্রহ্ম, আদ্যা শক্তি। সেই প্রতিবিম্বকে ধরেই সত্য সূর্যের দিকে যেতে হয়। সগুণ ব্রহ্মই প্রার্থনা শোনেন। তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দেন। ভক্তের আমিরূপ আর্শীতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তির দর্শন হয়। আর্শী খুব পরিষ্কার চাই, ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়ে না।

১০০। তাঁর দেখা পেলে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না মায়ের দুধ খেতে পায়। দুধ পেলেই তার কান্না বন্ধ হয়ে যায়। তখন শুধু আনন্দ। ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণ কল্‌কলানি শব্দ। মৌমাছি যতক্ষণ ফুলে না বসে ততক্ষণ সে ভন্ ভন্ করে। পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়, পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। তবে আর এক কলসীতে ঢালতে গেলে আবার শব্দ হয়। মনুমেণ্টের নীচে থাকলেই গাড়ী ঘোড়া বাড়ী মানুষ সব দেখা যায়, উপরে উঠলে কেবল আকাশ। কাঠ পোড়াবার সময় পড়্ পড়্ শব্দ করে, পুড়ে গেলে আর শব্দ হয় না। জ্ঞান হলেই কর্মত্যাগ হয়। যতই ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবে ততই শান্তি, ততই অনান্দ। ঈশ্বর দর্শন হলে চিরশান্তি লাভ হয়।

যুগবাণী

দুই

স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ

১। মানবের মধ্যে যে দেবত্ব বা ব্রহ্মত্ব নিহিত, তাহার বিকাশ সাধনই ধর্ম।

২। মানবের মধ্যে যে পূর্ণতা সুপ্ত আছে তাহার প্রকাশ সাধনই শিক্ষা।

৩। বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না। নানা প্রকার জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষার সহায়ে ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সমৃদ্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।

৪। চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।

৫। আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। তাহা ছাড়া ঈশ্বর ফীশ্বর কিছুই আর নাই। জীব শিবই। 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' *

৬। আমাদের কর্তব্য, কাজ করে মরা, 'কেন' প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের নাই। সাহস অবলম্বন কর। আমার দ্বারা

---

* গীতাতে (১৮।৬১) আছে, 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।' অর্থাৎ হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম হবে। এই বিশ্বাস রাখ। ভয় ত্যাগ কর। প্রভু তোমার সঙ্গেই রয়েছেন।

৭। শরীর ত যাবেই। তবে কুড়েমিতে কেন যায়? মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল।

৮। কোন ভাল কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকে, তারাই কৃতকার্য হয়।

৯। জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নাই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসার-বন্ধন কেটে যায়, 'মুক্তি করতলায়তে।'

১০। আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বধর্ম-ত্যাগী ও মিশনারীগণের উপদিষ্ট ভাঙ্গাচোরা পথে নয়, আমাদের নিজেদের ভাবে, নিজেদের পথে উন্নতি করিতে হইবে।

১১। বীর্য, বীর্য্যই সাধুত্ব। দুর্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে উহা অভীঃ। যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয় তাহা এই অভীঃ। এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে। ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ।

১২। বীর্যবান্ হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষৎ সেই বলপ্রদ আলোকপ্রদ দিব্য দর্শনশাস্ত্র। আবার তাহা অবলম্বন কর। আর এই সকল রহস্যময় দুর্বলতাজনক বিষয় সমুদয় বিষবৎ পরিত্যাগ কর। উপনিষৎরূপ মহত্তম সত্য সকল

অতি সহজবোধ্য। যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহাও তদ্রূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্য সকল অবলম্বন কর। এইগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে পরিণত কর। তবে নিশ্চয়ই ভারতের উদ্ধার হইবে।

১৩। দুর্বল মস্তিষ্ক কিছুই করিতে পারে না। আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে। তোমরা সবল হও। গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্তী হইবে। তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতার ধর্ম পূর্বাপেক্ষা ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান্ বীর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

১৪। আমি চাই এমন লোক, যাহাদের শরীরের পেশী-সমূহ লৌহবৎ সুদৃঢ় ও স্নায়ুসমূহ ইস্পাতবৎ নমনীয় হইবে। আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা বজ্রোপাদানে গঠিত। বীর্য্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্র বীর্য্য, ব্রহ্মতেজ চাই।

১৫। চরম সত্য ও লোকাচারের মধ্যে আপোষ করিবার ভাব স্পষ্টই ঘোর কাপুরুষতার ফল। তোমরা বীর হও। যাহারা আমার উত্তর সাধক, সর্বাগ্রে তাহাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। কোন মতে, কোন কারণে লেশ মাত্র আপোষের ভাব থাকিবে না। পরম শ্রেষ্ঠ সত্য সমগ্র দেশে আচণ্ডালে বিতরণ কর। সম্মানের হানি, অথবা অপ্রিয়

বিরোধের ভাবনায় ভীত হইও না। শত প্রলোভনের বিপরীত আকর্ষণ জয় করিয়া যদি তুমি সত্যের সেবা করিতে পার তবে নিশ্চিত জানিও, তুমি এমন দিব্য তেজে পূর্ণ হইবে যে, তাহার সম্মুখে তুমি যাহা অসত্য জান তাহার উল্লেখ করিতে যাইয়া লোকে হটিয়া আসিবে। পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত অবিচলিত হইয়া যদি তুমি সমান ভাবে চৌদ্দ বৎসর সত্যের সেবা কর, তবে তুমি যাহা বলিবে তাহা শুনিতে ও বিশ্বাস করিতে লোকে বাধ্য। তখন দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর মঙ্গল বর্ষিত হইবে, তাহাদের সর্ব বন্ধন মুক্ত হইবে এবং সমগ্র দেশ উন্নত হইবে।

১৬। ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়॥
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

১৭। ধন থাকলে দারিদ্র্যের ভয় আছে। জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয় আছে। রূপে বার্ধক্যের ভয় আছে। গুণে খলের ভয় আছে। অভ্যুদয়ে ঈর্ষার ভয় আছে। এমন কি, দেহে মৃত্যুর ভয় আছে। এই জগতের সবই ভয়যুক্ত। তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। *

১৮। ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন-সমস্যার রহস্য-ভেদ

---

* ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্যশতকে' আছে, সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবা ভয়ম্।' অর্থাৎ ইহলোকে নরগণের সর্ব বস্তু ভয়যুক্ত, একমাত্র বৈরাগ্যই অভয়দায়ক।

কিছুতেই হইবার নয়। ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ—ইহাই যেন তোমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়।

১৯। ত্যাগই আসল কথা। ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগীই সকলকে সমান ভাবে দেখে; সকলের সেবায় সে প্রেমে নিযুক্ত হয়।

২০। ধন বা সন্তান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় না। কিন্তু একমাত্র ত্যাগ সহায়ে অমরত্ব লাভ হয়।†

২১। মন মুখ এক করে নিজের কর্তব্য সাধন করে যাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই হবে।

২২। ব্যাকুলতা, ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মত্ততাই যথার্থ ধর্মপ্রাণতা। কেবল ব্যাকুলতার বলেই জ্ঞানলাভ বা ঈশ্বর দর্শন হতে পারে।

২৩। আজকাল দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে? শাস্ত্রপথ ছেড়ে কেবল কতগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তাইত তোদের বলি, তোরা প্রাচীন কালের মত শাস্ত্রপথ ধরে চল। নিজেরা শ্রদ্ধাবান্ হয়ে দেশে শ্রদ্ধা আন।

২৪। হিন্দুর এখনকার ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই। আমাদের ধর্ম ঢুকেছেন এখন ভাতের হাঁড়িতে। এখনকার হিন্দুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়,

---

† উপনিষদে আছে, 'ন ধনেন, ন প্রজয়া, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব-মানশুঃ।'

জ্ঞানমার্গেও নয়, কেবল ছুঁৎমার্গে—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, ব্যাস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না।

২৫। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতেই থাকবে নাকি? যারা এক মুষ্টি অন্ন গরীবের মুখে দিতে] পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে? যারা অপরের নিশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ এক প্রকার মানসিক ব্যাধি। সাবধান!

২৬। কেবল দিনরাত খাদ্যাখাদ্যের বাদবিচার করেই জীবনটা কাটাতে হবে? না, ইন্দ্রিয়-সংযম করতে হবে? ইন্দ্রিয়-সংযমটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধরতে হবে। আর ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্যই ভাল মন্দ খাদ্যাখাদ্যের অল্প বিস্তর বিচার করতে হবে।

২৭। আহার, পোষাকাদি জাতীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করলে ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যা লাভে জাতীয়তার লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না, অধঃপাতের সূচনা হয়। কার্য্যানুরোধে বিজাতীয় পোষাক পরবে বৈকি। কিন্তু ঘরে ঠিক বাঙ্গালী বাবু হবি।

২৮। ধর্ম আমাদের মজ্জাগত। সকল সংস্কার ওর ভিতর দিয়েই আনতে হবে। নতুবা mass (জনসাধারণ) তা গ্রহণ করবে না। তা ছাড়া অন্য রকম করতে গেলে গঙ্গাকে ফিরিয়ে হিমালয়ে এনে অন্য পথে নিয়ে যাবার মতই অসম্ভব হবে।

২৯। শরীরটাকে খুব মজবুত করতে হবে এবং সকলকে শিখাতে হবে। দেখছিস্ নে, এখনো রোজ আমি ডাম্বেল কসি। রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় বেড়াবি, শারীরিক পরিশ্রম করবি। দেহ ও মন সমান ভাবে উন্নত হওয়া চাই।

৩০। সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম সেখানেই বিস্তার। যেখানে স্বার্থ-পরতা, সেখানেই সংকোচ। অতএব প্রেমই একমাত্র বিধি। যিনি প্রেমিক তিনিই জীবিত। যিনি স্বার্থপর তিনি মৃত। সেইজন্য অহেতুক প্রেম প্রয়োজন।

৩১। যেমন দুধের ভিতর সর্বত্র ঘি রয়েছে, ব্রহ্ম তদ্রূপ জগতের সর্বত্র রয়েছেন। কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন করলে দুধের মাখন উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়।

৩২। সকল সাধনার সার শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ করা। যিনি দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলের মধ্যেই শিব দেখেন, তিনি যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল শিলার মধ্যে শিব উপাসনা করেন সে প্রবর্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্ম নির্বিশেষে একটি দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিববোধে সেবা করে তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।

৩৩। আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না। আমি লাখ নরকে যাব, 'বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ' (বসন্ত ঋতুর ন্যায় লোকের কল্যাণ করে)। এই আমার ধর্ম।

৩৪। কায়মনোবাক্যে জগদ্ধিতায় হতে হবে। পড়েছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব। আমি বলি, দরিদ্রদেবো ভব। দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞানী দুঃস্থ—ইহারাই তোমার দেবতা হউক। আত্মবৎ ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।

৩৫। ফিলজফি (দর্শন), যোগ তপ ঠাকুর-ঘর আলোচাল কলা মূলো—এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্ম। পরোপকারই একমাত্র সার্বজনীন মহাব্রত, সার্বকালিক মহাধর্ম।

৩৬। যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অশ্রু মোচন অথবা পিতৃ-মাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুক্‌রা রুটী দিতে না পারে, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত সুন্দর মতবাদ হউক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্ব উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা গ্রন্থে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ আমি উহাকে ধর্ম বলি না। চক্ষু আমাদের পৃষ্ঠের দিকে নয়, সামনের দিকে। অতএব সম্মুখে অগ্রসর হও। আর যে ধর্মকে তোমরা নিজের ধর্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার উপদেশাবলী কার্যে পরিণত কর।

৩৭। ভালবাসা কখনো বিফল হয় না। আজই হউক কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্য জাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র দুঃখী দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বসিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও। তোমার হৃদয়ে প্রেম

আছে ত? তাহা থাকিলেই তুমি সর্বশক্তিমান্ হইবে। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ত? তাহা যদি হও তবে তোমার শক্তি কে রোধ করিতে পারে? চরিত্র-বলে মানুষ সর্বত্র জয়ী হইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্র-গর্ভেও রক্ষা করিয়া থাকেন। তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন। তোমরা বীর হও। তোমরা বীর হও।

৩৮। ভারতের যে কোন প্রকার সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্মপ্রচার আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে গেলে প্রথমে এদেশকে আধ্যাত্মিক ভাববন্যায় ভাসাইতে হইবে। প্রথমেই এইটি করা বিশেষ আবশ্যক। প্রথমতঃ আমাদিগকে এই কার্য্যে মনোযোগী হইতে হইবে যে, আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব সত্য নিহত আছে তাহা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া মঠসমূহ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র মহাভারতে ছড়াইতে হইবে। যেন ঐ সকল শাস্ত্রনিহিত মহাবাক্যের ধ্বনি উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ছুটিতে থাকে। সকলকেই এই শাস্ত্রসমূহে নিহিত উপদেশ শোনাইতে হইবে।

৩৯। যদি জগতে কিছু পাপ থাকে তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর। দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ।

৪০। যদি মাংস খেলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই তাহা ত্যাগ করিবে। পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভাল।

৪১। এখন রজোগুণের প্রাচুর্য্য দরকার। দেশের যে সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে কচ্ছিস্ তাদের ভেতর পনের আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন! এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে ত ঢের। এখন চাই, প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা। দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? এখন দেশের লোককে মাছ-মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুলতে হবে, জাগাতে হবে, কর্ম্মক্ষম করতে হবে। নতুবা ক্রমে দেশশুদ্ধ লোক জড়ত্ব প্রাপ্ত হবে, গাছ পাথরের মত জড় হয়ে যাবে। তাই বল্‌ছিলুম, মাছ-মাংস খুব খাবি।

৪২। জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সর্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও। একটুকু যা তোমার দেবার আছে, তাহা দিয়ে দাও। কিন্তু সাবধান! বিনিময়ে কিছু চেয়ো না।

৪৩। শরীর ত যাবেই, তবে কুড়েমিতেই কেন যায়? It is better to wear out than to rust out. (মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল)। মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্‌কি খেলবে, তার ভাবনা কি!

৪৪। Strike the iron while it is hot. (গরম

থাকতে থাকতে লোহার উপর ঘা মার)। কুড়েমির কাজ নয়। ঈর্ষা, অহমিকা ভাব গঙ্গাজলে জনমের মত বিসর্জন দাও। মহাশক্তিতে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ কর ও মহাবলে কাজে লেগে যাও। Work, Work, Work (কাজ, কাজ, কাজ)—এই মূলমন্ত্র হোক।

৪৫। যদি ভাল চাও ত ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গাজলে ফেলে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের মানব দেহধারী হরেক মানুষের পূজা করো গে। বিরাট আর স্বরাট্। বিরাটরূপ এই জগৎ। তাঁর পূজো মানে তাঁর সেবা। এরই নাম ধর্ম। ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসবো, কি আধ ঘণ্টা বসবো, ঐ বিচারের নাম ধর্ম নয়। এর নাম পাগলা গারদ।

৪৬। মুক্তি ফুক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ায়—'পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থে প্রাজ্ঞঃ উৎসৃজেৎ'। (পরোপকারের জন্যই সাধুদের জীবন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিবেন)। তোমার ভাল করলেই আমার ভাল হয়। অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই। অতএব কাজে লেগে যাও।

৪৭। আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাষ্য সকল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা পায়, তাহা করিতে হইবে। উহার সহিত অবৈদিক অন্যান্য ধর্মসমূহের তত্ত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে।

৪৮। পাঁচটি সৎভাবকে যদি তুমি হজম করিয়া নিজ জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে পার তাহা হইলে যিনি কেবল একটি পুস্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার চেয়ে তোমার শিক্ষা অনেক বেশী।

৪৯। আমাদের জাতিটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে। সেইজন্যই ভারতে এত দুঃখকষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয় তাই করতে হবে, নীচ জাতকে তুলতে হবে। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের উঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আনতে হবে। খাঁটী হিন্দুদেরই এই কাজ করতে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা সে সব দেশের ধর্মের দোষ নয়। ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুণই এই সব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্মের কোন দোষ নেই, লোকেরই দোষ।

৫০। তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর আর নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার তাহা শিক্ষা কর। কিন্তু মনে রাখিও, সেগুলিকে হিন্দুধর্মের মৌলিক আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে।

৫১। ভুলিও না ভারত, তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী।

৫২। লোকে যখন তোমায় মন্দ বলবে, তুমি তাদের আশীর্বাদ করবে। ভেবে দেখ, তারা তোমার কত উপকার কচ্ছে। অনিষ্ট যদি কারো হয় তো তাদের নিজেদেরই হচ্ছে। এমন জায়গায় যাও, যেখানে লোকে তোমায় ঘৃণা করে। তারা তোমার অহংটা মেরে মেরে তোমার ভেতর থেকে বার করে দিক্। তুমি তাহলে ভগবানের খুব কাছে এগুবে।

৫৩। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আমরা জপিতেছি, দাসোঽহম্, দাসোঽহম্। অন্ততঃ একবার জীবনে আমরা উচ্চারণ করি, শিবোঽহম্, শিবোঽহম্।

৫৪। শ্রদ্ধাবান্ হও, বীর্যবান হও। আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর পরহিতায় জীবন পাত কর—এই আমার আকাঙ্ক্ষা ও আশীর্ব্বাদ।

৫৫। অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়—এই তিনটী জিনিষ থাকলেই যে কোন ধর্ম আন্দোলনে অবশ্যই সফল হইতে পারা যায়। সিদ্ধিলাভের ইহাই উত্তম রহস্য।

৫৬। অহিংসা ঠিক কথা। নির্বৈর হওয়া বড় কথা। কথা ত বেশ। তবে শাস্ত্র বলেছেন, তুমি গৃহস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও তবে পাপ হবে। ইহাই গৃহীর ধর্ম।

৫৭। চামার, মুচি, মেথর, মুদ্দফরাসদের ভিতর গিয়ে বল, তোরাই জাতের প্রাণ, তোদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে। তোরা দুনিয়া ওলট পালট করতে পারিস্। একবার

তোরা গা নাড়া দিয়ে দাঁড়া দেখি। সারা জগতের তাক লেগে যাবে।

৫৮। বিদ্যাদান বড় দান। তবে গ্রামে যাতে মনুষ্যোচিত শিক্ষা বিস্তার হয় তাই কর। আর চাই নৈতিক চরিত্র। ছাত্রদের চরিত্র বজ্রবৎ গড়ে তোল।

৫৯। মেয়েদিগকে ধর্মপরায়ণ নীতিপরায়ণ করতে হবে। কালে যাতে তারা ভাল গিন্নী তৈরী হয় তাই করতে হবে। এই মেয়েদের সন্তান-সন্ততিগণ পরে এই সকল বিষয়ে আরো উন্নতিলাভ করতে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই মহৎ লোক জন্মায়।

৬০। মেয়েদিগকে কেবল পূজা-পদ্ধতি শেখালেই হবে না। সব বিষয়েই তাদের চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরাবাঈ প্রভৃতির জীবন-চরিত্র তাহাদিগকে বুঝিয়ে দিতে হবে। যাতে তারা নিজেদের জীবন এইরূপ আদর্শে গঠিত করতে পারে।

৬১। মেয়েদিগকে ধর্ম শিল্প বিজ্ঞান ঘরকন্না রন্ধন সেলাই শরীর-পালন—এই সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্মগুলি আগে শেখাতে হবে। নভেল, নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। মনে রেখো, কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করাই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম।

৬২। এই দেশের পুরুষেরা মেয়েদিগকে একেবারে manufacturing machine (সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র) মাত্র করে তুলেছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল

মেয়েদের এখন না তুললে বুঝি, তোদের আর উপায়ান্তর আছে ?

৬৩। ভারতের কল্যাণ স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার! সেই জন্যই স্ত্রী-মঠ স্থাপনার্থ, আমার প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গাগা, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের আকর স্বরূপ হইবে।

৬৪। তোমাদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে তার প্রধান কারণ ঐ সব শক্তি-মূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, যেখানে স্ত্রী-লোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে সমাজের কোন উন্নতির আশা নাই। এইজন্য এদের আগে তুলতে হবে। এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।

৬৫। কপট হিংসুক দাসভাবাপন্ন কাপুরুষ, যারা কেবল জড় বস্তুতে বিশ্বাসী, তারা কখনও কিছু করতে পারে না। ঈর্ষাই আমাদের দাসসুলভ জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক স্বরূপ। এমন কি, সবশক্তিমান ভগবান্ পর্য্যন্ত এই ঈর্ষার দরুণ কিছু করতে পারেন না।

৬৬। শাস্ত্র বলেন, খাদ্য ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ও ত্যজ্য হয়। প্রথম 'জাতি-দোষ'—যেমন পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি। দ্বিতীয় 'নিমিত্ত-দোষ'—যেমন ময়রার দোকানের খাবারে দশ

গণ্ডা মাছি মরে পড়ে আছে, রাস্তার ধূলোই কত উড়ে পড়ছে। তৃতীয় 'আশ্রয়-দোষ—যেমন অসৎ লোকের দ্বারা ছোঁয়া অন্নাদি।

৬৭। 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ—এই শ্রুতির অর্থ করতে গিয়ে শংকরাচার্য বলেছেন, আহার অর্থে ইন্দ্রিয়-বিষয়। আর রামানুজাচার্য আহার অর্থে খাদ্য ধরেছেন। আমার মতে এই উভয় অর্থের সামঞ্জস্য করে নিতে হবে।

৬৮। আত্মতত্ত্ব জানবার জন্য, আত্মোদ্ধারের জন্য, এই জন্ম-মরণ প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য, যমের মুখে গেলেও যদি সত্যলাভ হয়, তাহলে নির্ভীক হয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই ত মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। কাপুরুষরাই মৃত্যুর পূর্বে বার বার মরে, আর যারা বীর তারা একবারই মরে।

৬৯। প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। যে কোন সামান্য বাহ্য বিষয় ধরে ধ্যানাভ্যাস করলেও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার মন বসে সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে, মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবীর মূর্তিপূজা প্রচলিত।

৭০। ধর্ম ভাব সাধনার সহায়ক কীর্তন ফীর্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচে কুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির উর্দ্ধগতি হয় বটে; কিন্তু উহা স্থায়ী হয় না। নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়।

৭১। ভাবপ্রবণতা ধ্যানের সময় একবারে দাবিয়ে দিবি। এইটির বড় ভয়। যারা বড় ভাবপ্রবণ তাদের কুণ্ডলিনী শক্তি ফড় ফড় করে উপরে উঠে বটে ; কিন্তু উঠতেও যতক্ষণ আবার নামতেও ততক্ষণ। যখন তিনি নামেন তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন।

৭২। প্রত্যহ একাকী ধ্যান করবি। সব আপনা আপনি খুলে যাবে। ধ্যান করবার পূর্বে যখন নাড়ীশুদ্ধি করবি তখন মনে মনে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে জোরে আঘাত করবি ; আর বল্‌বি, 'মা জাগ, মা জাগ।' ধীরে ধীরে এই সব অভ্যাস করতে হয়।

৭৩। সংসারের সকলে যে পথে যাচ্ছে তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি ? তবে আর তোর পুরুষকার কি ? সকলে ত মরতে বসেছে ! তুই যে মৃত্যু জয় করতে এসেছিস্। মহাবীরের ন্যায় অগ্রসর হও। সর্বপ্রকার ক্লীবতা বর্জন কর।

৭৪। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। স্বদেশকে এই দুই ভাবে সমৃদ্ধ কর। তাহা হইলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

৭৫। ভয় কি ? মনে ঐকান্তিকতা থাকলে আমি নিশ্চয়ই বলছি, এজন্মেই মুক্তি হবে। তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস্ ? আত্মজ্ঞান লাভ করবই করব, এতে যে বাধাবিপদ সামনে পড়ে তা কাটাবই কাটাব। এইরূপ সুদৃঢ় সংকল্প চাই। মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, মরে মরুক। এ দেহ থাকে থাক, আর যায় যাক। আমি কিছুতেই ফিরে

চাইব না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে। এইরূপ সকল বিষয় উপেক্ষা করে এক মনে স্বীয় লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাই পুরুষকার।

৭৬। তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে তাদের মন বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হয় না। কিন্তু কৃপার পরীক্ষা হচ্ছে কামকাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা যদি কারো না হয়ে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করে নি।

৭৭। সন্ন্যাস-ধর্ম সাধনের কালাকাল নাই। শ্রুতি বলছেন, যখনই বৈরাগ্যের উদয় হবে তখনই প্রব্রজ্যা করবে।* জীবনের অনিত্যতা হেতু যৌবনেই ধর্মশীল হবে। কে জানে, কার কখন দেহ যাবে।†

৭৮। হামবড়া বা দলাদলি বা ঈর্ষা একেবারে জন্মের মত বিদায় করতে হবে। পৃথিবীর ন্যায় সর্বংসহা হতে হবে। এইটি যদি পার দুনিয়া তোমার পদতলে আসবে।

৭৯। বাল্য ও গাম্ভীর্য উভয় ভাব মিশ্রিত করবে। সকলের সহিত মিশিয়া চলিবে। অহংভাব দূর করিবে; সাম্প্রদায়িকতা-শূন্য হইবে। বৃথা তর্ক মহাপাপ।

৮০। আত্মার স্বরূপের কখন ব্যক্ত, কখনও বা অব্যক্ত ভাব হচ্ছে। এক আত্মাই (ব্রহ্মই) বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন। ইহাই বেদের সার রহস্য।

---

* জাবাল উপনিষদে আছে, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।

† গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ। অর্থাৎ যম মাথার চুল ধরে আছে, এই ভেবে ধর্মাচরণ করিবে।

৮১। জগৎপ্রপঞ্চের অব্যক্ত ও ব্যক্ত শক্তিকে মায়া বলে। যতক্ষণ না সেই মাতৃরূপিনী মহামায়া আমাদের পথ ছেড়ে দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা মুক্ত হতে পারি না।

৮২। হৃদয়টাকে সমুদ্রের মত বিশাল করে ফেল। জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব সকলের পারে চলে যাও। এমন কি, অশুভ এলেও আনন্দে উন্মত্ত হও। জগৎটাকে একটা ছবির মত দেখ। এইটি যেন মনে থাকে যে, জগতের কোন কিছুই তোমাকে বিচলিত করতে পারে না। আর এইটি জেনে জগতের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কর।

৮৩। আমাদের হৃদয়ে প্রেম, ধর্ম্ম ও পবিত্রতার ভাব যতই বাড়তে থাকে, আমরা বাইরে ততই প্রেম, ধর্ম্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাই। আমরা অপরের কার্যের যে নিন্দাবাদ করি তাহা বাস্তব পক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা। তুমি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটা ঠিক কর, যা তোমার হাতের ভিতরে রয়েছে। তাহা হইলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডটাও তোমার পক্ষে আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

৮৪। অনুভূতিই ধর্মের প্রাণ। কতকগুলি আচার নিয়ম সকলেই মেনে চলতে পারে। কতকগুলি বিধি নিষেধ সকলেই পালন করতে পারে। কিন্তু অনুভূতির জন্য কয়জন লোক ব্যাকুল হয়? ব্যাকুলতা, ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই যথার্থ ধর্মপ্রাণতা।

৮৫। আমাদের দেশের আহাম্মকদের বলিও, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরা জগতের শিক্ষক, ফিরিঙ্গীরা নহে। ইহলোকের

বিষয় অবশ্য তাহাদের নিকট হইতে আমাদিগকে শিখিতে হইবে।

৮৬। যদি দেহ-মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়ে শিবপূজা করা বৃথা। যাদের দেহ মন পবিত্র, শিব তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রার্থনা শুনেন। আর যারা অশুদ্ধচিত্ত হইয়াও অপরকে ধর্মশিক্ষা দেয়, তাহারা অসদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্য পূজা মানস পূজার বহিরঙ্গ মাত্র। মানস পূজা ও চিত্তশুদ্ধিই আসল জিনিষ। এইগুলি না থাকলে বাহ্য পূজার কোন ফল লাভ হয় না।

৮৭। পরের সেবা শুভ কর্ম। এই সৎকর্মের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অন্তরে যে শিব গুপ্ত রয়েছেন তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলের হৃদয়েই বিরাজ করছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাতে আমরা আমাদের মূর্তি দেখতে পাই না। আমাদের হৃদয়-দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা রয়েছে। সর্বাপেক্ষা প্রধান পাপ এই স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা।

৮৮। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পারিয়া (চণ্ডাল) পর্য্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।* বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে তাহা নহে। সমগ্র জগৎকে এই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের ধর্মের ইহাই লক্ষ্য, ইহাই উদ্দেশ্য। ধীরে ধীরে সমগ্র মানব জাতি যাহাতে আদর্শ ধার্মিক অর্থাৎ ক্ষমা,

* মনুসংহিতায় আছে, শূদ্রো ব্রাহ্মণতাম্ এতি, ব্রাহ্মণো শূদ্রতাম্।

ধৃতি, শৌচ, শান্তি, উপাসনা ও ধ্যান অভ্যাস করে, তজ্জন্য প্রাণপণ কর। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানব জাতি ক্রমশঃ ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করিবে।

৮৯। ধর্ম ও ঈশ্বর বলতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য বুঝায়। দুর্বলতা ও দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি শুদ্ধচিত্ত হও, তবেই তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা। তুমি যদি মুক্ত স্বভাব হও, অমৃতত্ব তোম'র করতলগত।

৯০। নির্বিঘ্নে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে হঠাৎ তাড়াতাড়ি কিছু করে ফেলা উচিত নয়। পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়—এই তিনটি গুণ, আবার সর্বোপরি প্রেম সিদ্ধি লাভের জন্য অমোঘ উপায়।

৯১। টাকায় কিছু হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না। ভালবাসায় সব হয়। চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

৯২। জীবনের অর্থ উন্নতি। উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার। আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন। উহাই জীবনের একমাত্র গতিনিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মহামৃত্যু। জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু। আর দেহান্তেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যু স্বরূপ।

৯৩। যে কর্মের দ্বারা আত্মস্বরূপ বিকাশিত হয়, তাহাই ধর্ম। যাহা দ্বারা আত্মস্বরূপ আবৃত হয়, তাহাই অধর্ম।

৯৪। যাঁরা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা তথাকথিত

কর্মীদের চেয়ে জগতের জন্য অনেক বেশী কাজ করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করেছে এমন একজন লোক হাজার ধর্মপ্রচারকের চেয়ে বেশী কাজ করে। চিত্তশুদ্ধি ও মৌনভাব থেকেই কথার ভেতর জোর আসে।

৯৫। চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষা যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণ সন্তানের একজন শিক্ষক দরকার হয়, চণ্ডাল সন্তানদের দশ জন আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখরবুদ্ধি করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' পাগলের কর্ম। দরিদ্র পদদলিত অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর হউক।

৯৬। কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোমাদের কাছে শিক্ষিত হয়। যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্র-বল, পরার্থপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সেকি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।

৯৭। আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় সনাতন আদর্শ বজায় রাখিতে হইবে এবং যথাসম্ভব প্রাচীন প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক।

৯৮। পাশ্চাত্য দেশসমূহ জাতীয় জীবনের যে সকল অপূর্ব প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছে, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভসমূহ

অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত। যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এই শক্তির বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ ও চীৎকার করা বৃথা।

৯৯। ত্যাগই আমাদের চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমরত্ব লাভ হইয়া থাকে। ত্যাগই মহাতেজ, ত্যাগই মহাশক্তি। ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। হিন্দুগণ, এই ত্যাগের পতাকা পরিত্যাগ করিও না। উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর।

১০০। অনুভূতিই হচ্ছে সার কথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর, হাজার বৎসর নিরামিষ খাও। ওতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জানবে, সর্বৈব বৃথা হল। আর আচার-বর্জিত হয়েও যদি কেহ আত্মদর্শন করতে পারে, তবে সেই অনাচারই উৎকৃষ্ট আচার। তবে আত্মদর্শন হলেও লোক-কল্যাণের জন্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল। দিনরাত বিধি-নিষেধ গণ্ডীর মধ্যে থাকলে আত্মার বিকাশ হবে কি করে? যে যতটা আত্মবিকাশ করতে পেরেছে, তার বিধি-নিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য শঙ্করই বলেছেন, "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।"

সমাপ্ত

কাটোয়া
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৪২ খ্রীঃ হইতে প্রায় প্রত্যেক বৎসর মাঘ মাসে উক্ত আশ্রমে শ্রীশ্রীরটন্তী কালীপূজা হইতেছে। প্রত্যেক বৎসর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে ১৯৩৯ ও ১৯৪২ খ্রীঃ স্বামী অসঙ্গানন্দ, ১৯৪১খ্রীঃ স্বামী সুন্দরানন্দ, ১৯৪৩ খ্রীঃ স্বামী মনীষানন্দ, ১৯৪৪ ও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ১৯৪৯ খ্রীঃ স্বামী মৈথিল্যানন্দ এবং ১৯৫১ ও ১৯৫২ ও ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ আগমন করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে আসিয়া ঘোষেশ্বর নাটমন্দিরে ৫।৬ দিন ধরিয়া গীতা, চণ্ডী ও ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং স্থানীয় হাই স্কুলে স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রবাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৯৫৩ খ্রীঃ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবে আসিয়া ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন সহযোগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন। উক্ত সভায় প্রায় দেড় হাজার নর-নারী উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের পূর্বে তিন দিন তিনি স্থানীয় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ও বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধাদি বিনামূল্যে বিতরিত হয় এবং দুঃস্থ নরনারীকে চাউল, টাকা ও বস্ত্রাদি দান করা হয়। কাটোয়া সহরের এক সুন্দর নির্জন প্রান্তে আশ্রমের নিজস্ব চারি বিঘা জমি সংগৃহীত ও তদুপরি দুইখানি পাকা ঘর নির্মিত হইয়াছে। আশ্রমের অতি সন্নিকটে আরও এক বিঘা জমি পাওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত জমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির এবং সারদা পাঠাগার ও বিবেকানন্দ ছাত্রাবাস স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। একটী কার্যকরী সমিতি কর্তৃক আশ্রম পরিচালিত হয়। শীঘ্রই উহার নূতন ট্রাষ্ট-বোর্ড গঠিত হইবে।

সংবাদ-পত্রের অভিমত

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ৩১শে শ্রাবণ ১৩৬০ (১৬ আগষ্ট, ১৯৫৩) রবিবার 'যুগবাণী' সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে :

"যুগাবতার ভগবান রামকৃষ্ণ এবং তদীয় শিষ্য পুরুষসিংহ স্বামিজীর উপদেশাবলী আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে সংকলিত হইয়াছে। প্রথম ভাগে পরমহংসদেবের একশতটী প্রসিদ্ধ উপদেশ এবং দ্বিতীয় ভাগে স্বামিজীর উপদেশাবলী হইতে নির্বাচিত এক শতটী উপদেশ বা বাণী এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। পরমহংসদেব এবং স্বামিজী বর্তমান ভারতের যুগ্ম স্রষ্টা, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের বাণীর সমালোচনা না করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে নিত্য পাঠ্যরূপে গৃহীত হওয়া উচিত ; এবং তাহাতে আধ্যাত্মিক বা মানসিক উন্নতি সাধারণের পক্ষেও কম বেশী লভ্য বা লব্ধ হইবে। ভূমিকায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামীজির সংক্ষিপ্ত জীবনী যোজনা করায় ক্ষুদ্র পুস্তক খানি মূল্যে প্রকৃতই বৃহৎ ও সমৃদ্ধ হইয়াছে।"